বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

(উপন্যাস)

ডঃ তাপস অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামপুর কলেজ

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

আধুনিক বাংলা সাহিত্য যার উপর ভিত্তি করে বিকাশ লাভ করেছে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর মূল পরিচয় কবি হিসাবে হলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তিনি অবাধে পদচারণা করেছেন। বাংলা কবিতা, বাংলা নাটক, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য, বাংলা পত্রসাহিত্য, বাংলা ভ্রমণসাহিত্য, বাংলা গান প্রভৃতিতে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ রবীন্দ্রনাথের হাতেই ঘটেছিল। এতসব করার পাশাপাশি সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসেও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য চর্চা শুরু করেন তখন বাংলা কাব্যক্ষেত্রে মধুসূদনের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল মহাকাব্য রচনার যুগ, আর উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের দ্বারা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যুগ। রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তীদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না বলে মনস্থির করলেও যুগের অনিবার্য প্রভাব থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেননি। তাই যুগের প্রভাবেই তিনি প্রথমে ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে ‘বৌঠাকুরনীর হাট’(১৮৮৩) ও ‘রাজর্ষি’(১৮৮৭) নামে দু’টি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর ‘বৌঠাকুরণীর হাট’ উপন্যাসে রাজা প্রতাপাদৈত্য, তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য ও কন্যা বিভা এবং পিতৃব্য বসন্ত রায়ের ঐতিহাসিক কাহিনি এবং ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মানিক্যের ঐতিহাসিক কাহিনি স্থান পেলেও এই দু’টি উপন্যাসে ইতিহাস এসেছে ডিমের খোলসের মত অর্থাৎ বাইরের আবরণের মত, যার ভেতরে বাস্তব নরনারীর হৃদয়গত কাহিনিই স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁর ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন ‘বিসর্জন’ নাম দিয়ে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের ‘বৌঠাকুরণীর হাট’-কে প্রথম উপন্যাস হিসাবে ধরা হলেও এর আগে তিনি ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘করুণা’ নামে একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। কিন্তু এটি উপন্যাস হয়নি বলে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন এবং তা প্রকাশ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ইতিহাসকে আশ্রয় করে পরপর দু’টি উপন্যাস রচনা করলেও পরবর্তীকালে আর ইতিহাসকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করেন নি। ‘রাজর্ষি’ রচনার প্রায় ১৬বছর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘চোখের বালি’ উপন্যাসটি রচনা করেন। পূর্ববর্তী দু’টি উপন্যাসে ইতিহাসের আড়ালে কাহিনির অবতাড়না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ‘চোখের বালি’র ক্ষেত্রে কাহিনি অর্থাৎ ঘটনা পরম্পরার বিবরণ না দিয়ে চরিত্র সৃষ্টির দিকে গুরুত্ব দেন। এই উপন্যাসের বিনোদিনী, মহেন্দ্র, বিহারী, আশালতা, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা প্রমুখ চরিত্রগুলি সৃষ্টি করে তাদের মনের কারখানা ঘরে প্রবেশ করে সেখান থেকে ‘আঁতের কথা’ বের করে আনেন। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ হল বাংলা ভাষার প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণে, ঘটনা সংস্থাপণে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ‘চোখের বালি’র বিনোদিনী চরিত্রকে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিকা নারীর স্বীকৃতি দেন।

‘চোখের বালি’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে নানা বিতর্ক বেঁধেছিল। হয়ত এই বিতর্কে জল ঢেলে দেবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘চোখের বালি’ প্রকাশের তিন বছর পর ‘নৌকাডুবি’(১৯০৬) উপন্যাসটি প্রকাশ করেন। এটি মূলতঃ কাহিনি প্রধাণ উপন্যাস এবং ‘চোখের বালি’র তূলনায় অনেকটাই নিকৃষ্ট মানের রচনা।

এরপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘গোরা’(১৯১০) উপন্যাসটি রচনা করেন। বিভিন্ন কারনে ‘গোরা’ উপন্যাসটি আজও গুরুত্বপূর্ণ। এই উপন্যাসটি দেশ, কাল, সীমা প্রভৃতিকে অতিক্রম করে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি লাভ করে বাংলা সাহিত্যের একটি মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস হয়ে উঠেছে। ‘গোরা’ উপন্যাসের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা আদর্শ, নানা দর্শন, নানা ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় এক আইরিশ দম্পতির পরিত্যক্ত সন্তান গোরা হিন্দু পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে নিজেকে হিন্দু ভাবে ও হিন্দু পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখে। আর একারনেই সে তার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশকে খোঁজে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখা যায় তাঁর সমস্ত খোঁজা ব্যর্থ হয় এবং মা আনন্দময়ীর কাছে সে সব প্রশ্নের জবাব পায়। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কাটিয়ে উঠে বৃহত্তর মানবতার জয়গান গেয়েছেন। ‘গোরা’ উপন্যাসের গোরা ও তার

মা আনন্দময়ী ছাড়াও আর দু'টি বিখ্যাত চরিত্র হল গোরার বন্ধু বিনয় এবং এই উপন্যাসের নায়িকা সুচরিতা।

'গোরা' উপন্যাসের পর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের দু'টি উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি ক্ষুদ্রাকৃতির হলেও বিশেষ তাৎপর্যবাহী উপন্যাস। এই উপন্যাসটিকে রবীন্দ্রনাথ আলাদা আলাদা নাম দিয়ে চারটি ভাগে ভাগ করে এই উপন্যাসের চরিত্র শ্রীবিলাসের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসের নায়ক শচীশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনের লক্ষ্য খুঁজেছেন। তাই আমরা দেখি শচীশ কখনো জ্যাঠামশাই-এর সাথে পরোপকারের মতো মহৎকার্যে জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছে, আবার কখনো বা লীলানন্দ স্বামীর প্রভাবে রসের জগতে পদচারণা করে মুক্তি খুঁজেছে। কিন্তু যখন কোথাও মুক্তি পায়নি তখন সে অরূপলোকে নিজের আত্মানুসন্ধান করেছে। উপন্যাসের নায়িকা দামিনী এই পার্থিব জগতের মাঝেই নিজেকে, নিজের প্রেমকে খুঁজেছে। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসেই প্রথম বিধবা রমণীর বিয়ে দিয়েছেন। যা রবীন্দ্র সৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

'চতুরঙ্গ' প্রকাশের বছরেই রবীন্দ্রনাথের আর একটি উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। রবীন্দ্রনাথ নিজে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পথে নামলেও দেশ সেবার নামে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপকে তিনি যে সমর্থণ করতেন না, তা এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা জানি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মূল কর্মসূচী ছিল স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন। ফলে দেশবাসী বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের জন্য পথে নেমেছিল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন শুধু বিদেশি দ্রব্য বয়কট করলে চলবেনা, তার পরিপূরক স্বদেশি দ্রব্য উৎপাদনও করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসের চরিত্র নিখিলেশের মাধ্যমে। নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ উগ্র স্বদেশি। সে আপন বাক্‌চাতুর্য দ্বারা জনমত গড়ে তুলে শুধু বিদেশি দ্রব্য বর্জনের কথাই ভাবত— বিকল্প কোন চিন্তা করত না। উপন্যাসের নায়িকা নিখিলেশের পত্নী বিমলা 'ঘরে-বাইরে'র-এই দ্বন্দের মাঝে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। উপন্যাসটি সন্দীপ, নিখিলেশ ও বিমলার আত্মকথনে রচিত।

'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' প্রকাশের পর দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। এরপর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'শেষের কবিতা' ও 'যোগাযোগ' উপন্যাস দু'টি প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পটভূমি হিসাবে প্রথম শহর কলকাতাকে বাদ দিয়ে শিলং পাহাড়কে গ্রহণ করেন। এই পাহাড়ের রোমান্টিক পরিবেশে অমিত-লাবণ্যের প্রেমকে দেখান। 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস হলেও অনেকটা কাব্যধর্মী রচনা। সমকালে রবীন্দ্র সাহিত্যে আধুনিকতা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছিলেন। আর 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'তিনপুরুষ' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এই উপন্যাসে তিন পুরুষের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী সমাজে সামন্ত্রতন্ত্রের অবক্ষয় ও ধনতন্ত্রের আগমণ ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে দেখিয়েছেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথ 'দুইবোন'(১৯৩৩), 'চার অধ্যায়'(১৯৩৪) এবং 'মালঞ্চ'(১৯৩৪) নামক তিনটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এগুলি উপন্যাস হিসাবে ততটা উৎকৃষ্ট মানের রচনা নয়। 'চার অধ্যায়'-এ রবীন্দ্রনাথ দেশের জাতীয় সংকট মূহুর্তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল তার একটি রূপকে দেখাতে চেয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি এই উপন্যাসে অতীন্দ্র-এলার প্রেমকেও দেখিয়েছেন। নারী যে দু'রূপে পুরুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে— প্রিয়ারূপে এবং জননী রূপে এই তত্ত্বটি প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'দুইবোন' উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এখানে নায়ক শশাঙ্ক এবং দুইবোন শর্মিলা ও ঊর্মিমালার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস 'মালঞ্চ' মূলতঃ কাহিনি প্রধাণ উপন্যাস।

এ ভাবেই রবীন্দ্রনাথ একের পর এক ভিন্নধর্মী উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান রেখে গেছেন। রবীন্দ্র উপন্যাস পাঠ করতে গেলে যদি আমরা কাহিনি আশা করি তা হলে ভুল করব। তিনি প্রায় সব উপন্যাসেই কোন না কোন তত্ত্বের অবতাড়ণা করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাস যেমন আমাদের ইতিহাস

চেতনাকে জাগিয়ে তোলে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস যেমন আমাদের হৃদয়বোধকে নাড়া দেয় তেমনি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আবেদন আমাদের বুদ্ধির কাছে। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করলেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মর্মার্থ অনুধাবন করা সম্ভব। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান এখানেই।

বাংলা কথাসাহিত্য শরৎচন্দ্রের অবদান

বাংলা সাহিত্যের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৭৬-১৯৩৮)। রবীন্দ্র সূর্য যখন বাংলা সাহিত্যাকাশের মধ্যগগণে বিরাজ করছিল তখন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে কুন্তলীন পুরস্কার পাওয়া 'মন্দির' গল্পটির মধ্য দিয়ে পরবর্তীকলের এই জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে। এরপর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' গল্পটির মাধ্যমে তিনি পাঠক সমাজের সাথে পরিচিত হন। যদিও গল্পটির প্রকাশের সময় অনেকে মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ হয়ত ছদ্মনামে এই গল্পটি রচনা করেছেন। এরপর একের পর এক জনপ্রিয় উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র পাঠক সমাজের একেবারে কাছাকাছি চলে আসেন। শরৎচন্দ্রের পূর্বে বাংলা কথাসাহিত্যের পাঠক বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের দ্বারা ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের এবং রবীন্দ্রনাথের কিছু তত্ত্ব-দর্শন মূলক উপন্যাস পাঠ করেছিল। শরৎচন্দ্র প্রথম এই পাঠকদের ইতিহাস ও তত্ত্বকথার মায়াজাল থেকে বের করে বাস্তব নরনারীর জীবন নির্ভর কাহিনির প্রতি আকৃষ্ট করেন।

শরৎচন্দ্র নিজে ছিলেন ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে গিয়ে যা কিছু দেখেছিলেন তাঁর রচিত সাহিত্যে সেগুলিরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে শহুরে জীবন থেকে মুক্ত করেন। তাঁর রচনায় প্রথম বাংলার গ্রাম্যজীবন এবং সেখানকার নারীদের হৃদয়ধর্ম প্রাধাণ্য পায়। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজেই একবার বলেছিলেন—

''সংসারে যারা শুধু দিলে পেলো না কিছু, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসেব নিলে না, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলেনা— সমস্ত থেকেও কোন কিছুতে তাদের অধিকার নাই * * * এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে; এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।''

সমগ্র শরৎ সাহিত্যে এই বঞ্চিত, দুর্বল, উৎপীরিত, নিরুপায়, মানুষদের কথাই বর্ণিত হয়েছে— যা তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। শরৎচন্দ্র প্রথম বাংলা সাহিত্যকে অভিজাততন্ত্র থেকে মুক্ত করে সর্বসাধারনের জন্য খুলে দেন।

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণে আমরা শরৎচন্দ্রের রচনাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি—

১) পারিবারিক কাহিনি চিত্র:

'বিন্দুর ছেলে'(১৯১৪), 'রামের সুমতি'(১৯১৪), 'মেজদিদি'(১৯১৫), 'মামলার ফল', 'নিস্কৃতি'(১৯১৭), 'বৈকুণ্ঠের উইল'(১৯১৫), 'একাদশী বৈরাগী'(১৯১৮), 'মহেশ'(১৯২৬) ইত্যাদি।

২) সমাজ বিধির প্রাধাণ্য চিহ্নিত দাম্পত্য প্রেম ও বিরহের কাহিনি:

'বড়দিদি'(১৯১৩), 'পরিণীতা'(১৯১৪), 'বিরাজ বৌ'(১৯১৪), 'দর্পচূর্ণ'(১৯১৫), 'পথনির্দেশ'(১৯১৪), 'চন্দ্রনাথ'(১৯১৬), 'দেবদাস'(১৯১৭), 'কাশীনাথ'(১৯১৭), 'স্বামী'(১৯১৮), 'ছবি'(১৯২০) এবং 'সতী'(১৯৩৪) ইত্যাদি।

৩) সমাজ সংস্কার মূলক উপন্যাস:

'পল্লীসমাজ'(১৯১৬), 'অরক্ষণীয়া'(১৯১৬) এবং 'বামুনের মেয়ে'(১৯২০)।

৪) পূর্বরাগ পুষ্ট মধুরান্তিক প্রেমের উপন্যাস:

'দত্তা'(১৯১৮) এবং 'দেনাপাওনা'(১৯২৩)।

৫) নিষিদ্ধ সমাজ বিরোধি প্রেমের উপন্যাস:

'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ'(১৯২১) এবং 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব-১৯১৭, ২য় পর্ব-১৯১৮, ৩য় পর্ব-১৯২৭, ৪র্থ পর্ব-১৯৩৩)।

৬) মতবাদ প্রধাণ উপন্যাস:

'পথের দাবী'(১৯২৬), 'শেষপ্রশ্ন'(১৯৩১) এবং 'বিপ্রদাস' (১৯৩৪)।

শরৎচন্দ্রের পারিবারিক উপন্যাসগুলিতে বাঙালী পরিবারে নানা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি আছে। এই রচনাগুলিতে শরৎচন্দ্র তাঁর বাস্তত অভিজ্ঞতার দ্বারা বাঙালী পরিবারের জীবন্ত ছবি এঁকেছেন। তিনি পরিবারে গন্ডীর মধ্য থেকেই এই সমস্ত উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে সুসম, সূক্ষ্ম, মনস্তাত্ত্বসম্মত ভাবে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে গ্রামীণ অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত মানুষরাই প্রাধাণ্য পেয়েছে। 'রামের সুমতি', 'মামলার ফল', 'বৈকুণ্ঠের উইল' প্রভৃতি রচনাগুলি পড়লেই তা জানা যায়।

শরৎচন্দ্র নারী হৃদয় ও নারীর প্রেমকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর সমাজবিধির প্রাধাণ্য চিহ্নিত দাম্পত্য প্রেম ও বিরহের কাহিনিগুলিতে। এই শ্রেণির রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'বড়দিদি' ও 'দেবদাস'। 'বড়দিদি'-তে সমাজগন্ডীর মধ্যে থেকেও এক বিধবার প্রেমকে শরৎচন্দ্র মাধূর্য দান করেছেন; 'দেবদাস'-এর নায়িকা পার্বতী নিজ স্বামী ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালনে কোন ত্রুটি না রেখেও নিজ হৃদয়কন্দরে তার বাল্যপ্রেমকে কিভাবে আঁকড়ে রেখেছিল তার পরিচয় আছে। প্রেমের ছোঁয়ায় এক বারবণিতাও কিভাবে শুদ্ধ হয়ে ওঠে শরৎচন্দ্র তা এই উপন্যাসের চন্দ্রমূখী চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। আর 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নারীর প্রেমকে অন্য মাত্রায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

সমাজ সংস্কারমূলক উপন্যাসগুলিতেও শরৎচন্দ্র মূলতঃ বাংলার গ্রামে-গঞ্জে প্রচলিত কু-সংস্কারগুলির ভয়ংকর রূপকে দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পল্লীসমাজ'। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা কিভাবে নরনারীর মিলনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তা এই উপন্যাসের নায়ক রমেশ ও নায়িকা রমার মাধ্যমে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন। 'অরক্ষণীয়া' এবং 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র কুলীন সমস্যার অবতাড়না করেছেন।

শরৎচন্দ্রের পূর্বরাগপুষ্ঠ মধুরান্তিক প্রেমের উপন্যাস দু'টি অর্থাৎ 'দত্তা' ও 'দেনাপাওনা'-র বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্ব আছে। এই দু'টি উপন্যাসে শরৎচন্দ্র গ্রামীণ জমিদারী সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ে এসেছেন। তিনি 'দেনাপাওনা'-য় দেখিয়েছেন প্রেমের স্পর্শে কিভাবে একজন অত্যাচারী জমিদারও নবজীবন লাভ করেন। আর 'দত্তা'-য় শরৎচন্দ্র জটিল বিশ্লেষণে না গিয়ে এক সহজ-সরল-নির্মল প্রেম কাহিনির অবতাড়না করেছেন।

শরৎচন্দ্রের খ্যাতি-অখ্যাতি যাইহোক না কেন তা মূলতঃ তাঁর সমাজ বিরোধি উপন্যাসগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতেই শরৎচন্দ্র প্রথম সামজিকতার বাঁধা অতিক্রম করেছেন। তাঁর নিষিদ্ধ সমাজ বিরোধি উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথম উপন্যাস হল 'চরিত্রহীন'। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নায়িকা হিসাবে নিয়ে এসেছেন এক মেসের ঝিকে। তিনি কিরন্ময়ী চরিত্রের মাধ্যমে নারীর আধুনিক রূপকে দেখিয়েছেন— যে নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সব সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে শুধু পড়ে পড়ে মার খায় না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করে। শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মহিম-অচলা-সুরেশকে কেন্দ্র করে এক ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনির উপস্থাপণা করেছেন। এখানে মানুষের জীবন সমস্যার জ্বলন্তরূপ চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা অচলা নারী ব্যক্তিত্বের কঠিনতম সমস্যায় জর্জরিত ও রক্তাত্ব হয়ে উঠেছে। 'গৃহদাহ'-কেই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ধরা হয়। শরৎচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনিমূলক উপন্যাস চারখন্ডে প্রকাশিত 'শ্রীকান্ত'-এ তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এই ঘটনাগুলি কখনো ইন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে, কখনো অন্নদাদিদিকে কেন্দ্র করে আবার কখনো রাজলক্ষ্মীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ হয়েছেন মতবাদপ্রধাণ উপন্যাসগুলিতে। কারণ এক্ষেত্রে তিনি মানুষের হৃদয় প্রবৃত্তিকে এড়িয়ে তত্ত্ব কথাকেই অধিক প্রাধাণ্য দিয়েছেন। তবে ভারতবর্ষে

ইংরেজবিরোধি আন্দোলনের সময় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বিপ্লবীদের মধ্যে বেশ প্রভাব ফেলেছিল। এ করণেই ইংরেজ সরকার উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হন।

যাইহোক শরৎচন্দ্র দীর্ঘদিন বাংলা সাহিত্যের চর্চা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে এক নতুন মাত্রায় পৌছে দিয়েছেন। যেসব কারণে শরৎচন্দ্রের রচনা বাংলা সাহিত্যকে নতুন মাত্রা দিয়েছিল সেগুলি হল—

প্রথমত:

শরৎচন্দ্র প্রথম বাংলাকথা সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'বাবু কালচার'-কে ভেঙে বাংলার বহু বিচিত্র পেশায় জড়িত মানুষ ও তাদের জীবনাচরণের ছবি নিয়ে আসেন। তাঁর রচনায় জমিদার থেকে শুরু করে চাষীর ছেলে, কামার, কুমোর, ঘরামী, সাপুরে প্রভৃতি বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তিতে নিয়োজিত মানুষেরা প্রাধাণ্য পায়। শরৎচন্দ্রের পূর্বে এরূপ মানুষ জনের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের ততটা পরিচয় হয়নি।

দ্বিতীয়ত:

শরৎচন্দ্র প্রথম চালচুলোহীন, ভবঘুরে হয়ে জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথ দেখান। তিনি নিজ জীবন ও কীর্তি দিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপণ করেছিলেন পরবর্তীকালে 'কীর্তিবাস গোষ্ঠী' বা 'হাঙ্গেরী কবিতা' আন্দোলনে তার অভিক্ষেপ ধরা পড়েছে।

তৃতীয়ত:

শরৎচন্দ্র প্রথম ইতিহাস-তত্ত্ব নির্ভর সাহিত্যকে পরিত্যাগ করে বাস্তব নির্ভর সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হন। তাই বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যখন 'কল্লোল গোষ্ঠী'-র দ্বারা বাস্তব নির্ভর সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টা শুরু হয় তখন এরা শরৎচন্দ্রের কাছে অঞ্জলি পাতেন।

চতুর্থত:

শরৎচন্দ্রের রচনায় বুদ্ধিদীপ্তি না থাকলেও সহজতা এবং আবেগের এমন স্পর্শ আছে যা খুব সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে। চমকসৃষ্টি না করে বা কল্পনার আশ্রয় না নিয়েও যে জনপ্রিয়তা লাভ করা যায় তা শরৎচন্দ্র প্রথম করে দেখান।

এসব কারনেই শরৎচন্দ্র তাঁর সময় থেকে এখনও পর্যন্ত সমানভাবে বাঙালী হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের রচনাবলী ইংরেজিসহ বিভিন্নভাষাতে অনুদিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁর রচনাগুলি থেকে এখনও সিনেমা তৈরি হচ্ছে এবং টেলিভিশনে ধারাবাহিক নির্মিত হচ্ছে। একজন রচয়িতার মৃত্যুর এত বছর পরেও এরূপ জনপ্রিয়তা তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের গুরুত্ব এখানেই।

ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তীযুগে বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার যাদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের মধ্যে বয়োঃজ্যোষ্ঠ ছিলেন বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৫০), এরপর তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮-১৯৭১) এবং বয়োঃকনিষ্ঠ ছিলেন মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯০৮-১৯৫৬)। এরা বাংলা কথাসাহিত্যকে বঙ্কিমের ইতিহাস প্রবণতা থেকে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং শরৎচন্দ্রের আবেগ সর্বস্বতা থেকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে বিভূতিভূষণ তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে এসে এই দুইয়ের সম্পর্ক দেখান এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়োডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব ও মার্কসীয় সাম্যবাদকে তাঁর কথাসাহিত্যে প্রয়োগ করেন। আর আমাদের আলোচ্য তারাশংকর নিজে ছিলেন এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান। তাঁর সময় বাংলাদেশ থেকে সামন্ততন্ত্র অর্থাৎ জমিদারতন্ত্র লোপ পাচ্ছিল এবং ধনতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করছিল। দুইকালের দ্বন্দ্বকেই রূপদান করেছেন। পাশাপাশি বীরভূমের ময়ুরাক্ষী তীরবর্তী লাভপুরের মানুষ তারাশংকর

যে অঞ্চলের মানুষ হয়েছিলেন তাঁর সেই অঞ্চলকেই নিজের সাহিত্যে স্থান দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার আমদানি ঘটান।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, তারাশংকর বীরভূমের লাভপুরে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করে বর্ধিত হয়েছিলেন। এই অঞ্চলটি দীর্ঘকাল ধরে বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশে রাঢ় অঞ্চল নামে পরিচিত। এখানে উচ্চবর্ণের মানুষের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর পরিমানে সাঁওতাল, বাগ্‌দি, দুলে, কাহার, কোল, মুন্ডা, সদ্‌গোপ প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষজন বসবাস করে আসছে। জমিদারের সন্তান তারাশংকর তাঁর রচনায় সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিরোধ দেখাতে গিয়ে এই নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির মানুষজনকেই বারবার চিত্রিত করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালীঘূর্ণি' ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং শেষ উপন্যাস 'নবদিগন্ত' ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর মাঝে তিনি যে সমস্ত উপন্যাস লিখেছেন তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'পাষাণপুরী'(১৯৩৩), 'নীলকণ্ঠ'(১৯৩৩), 'রাইকমল'(১৯৩৪), 'প্রেম ও প্রয়োজন'(১৯৩৫), 'আগুন'(১৯৩৭), 'ধাত্রীদেবতা'(১৯৩৯), 'কালিন্দী'(১৯৪০), 'গণদেবতা'(১৯৪২), 'মন্বন্তর'(১৯৪৪), 'পঞ্চগ্রাম'(১৯৪৪), 'কবি'(১৯৪৪), 'সন্দীপণ পাঠশালা'(১৯৪৫), 'ঝড় ও ঝড়াপাতা'(১৯৪৬), 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'(১৯৪৭), 'পদচিহ্ন'(১৯৫০), 'উত্তরায়ণ'(১৯৫০), 'তামস তমস্যা'(১৯৫২), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'(১৯৫২), 'আরোগ্য নিকেতন'(১৯৫৩), 'চাপা ডাঙ্গার বৌ'(১৯৫৪), 'সপ্তপ্রদীপ'(১৯৫৭), 'রাধা'(১৯৫৪), 'না'(১৯৬০), 'নাগরিক'(১৯৬০), 'কালবৈশাখী'(১৯৬৩), 'মঞ্জুরী অপেরা'(১৯৬৪), 'ভূবনপুরের হাট'(১৯৬৪), 'অরণ্যবহ্নি'(১৯৬৬), 'মহানগর'(১৯৬৬), 'ফরিয়াদ'(১৯৭১) প্রভৃতি।

তারাশংকরের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলিতে বন্ধনমুক্তির ব্যকুলতা এবং বৈষ্ণবীয় চেতনা স্থান পেয়েছে। তারাশংকর জমিদারের সন্তান এবং ঔপন্যাসিক হলেও আদ্যোন্ত ছিলেন একজন সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ইংরেজ বিরোধি কার্যকলাপের জন্য তিনি জেল পর্যন্ত খাটেন। আবার তারাশংকর যে অঞ্চলের মানুষ সে অঞ্চলে দীর্ঘদিন বৈষ্ণবধর্ম ব্যপক বিস্তার লাভ করেছিল। 'চৈতালীঘূর্ণি' 'পাষাণপুরি' 'রায়কমল', 'আগুন' প্রভৃতি প্রথম দিককার উপন্যাসগুলিতে তারাশংকর এই রাজনীতি ও বৈষ্ণবধর্মকে স্থান দিয়েছেন।

এরপর তারাশংকরের 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি' প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এগুলি ঔপন্যাসিক তারাশংকরের জীবনের মাইলফলকও বটে। এর মধ্যে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের নায়ক শিবনাথের মধ্য দিয়ে তারাশংকর নিজেকেই প্রকাশ করেছেন জন্য অনেকেই এই উপন্যাসটিকে তারাশংকরের আত্মজীবনিমূলক উপন্যাস বলেন। তারাশংকরের 'গণদেবতা' ও তার পরিপুরক উপন্যাস 'পঞ্চগ্রাম'-এ রাঢ় অঞ্চলের মানুষজনের নিরিখে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিরোধকে দেখানো হয়েছে। এই দু'টি উপন্যাসে পুরাতন দিনের প্রতিনিধি দেবুঘোষ ও তার অনুগামীরা আর ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি ছিরু পাল অর্থাৎ শ্রীহরি।

রাঢ় অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে কবিগান জনপ্রিয়। এই কবিগান এবং তার দর্শককে তারাশংকর তাঁর 'কবি' উপন্যাসে নিতাই কবিয়ালের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসে নিতাই-এর গান— 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পকিলে কান্দো কেনে', 'হায় জীবন এত ছোট কেনে' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। আর 'কালিন্দী' উপন্যাসে কালিন্দী নদীর তীরে গড়ে ওঠা একটি চরকে কেন্দ্র করে জমিদারতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষকে তিনি দেখিয়েছেন। তারাশংকরের এই পর্বে দুই কালের দ্বন্দ্ব যেমন বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে তেমনি রাঢ় অঞ্চলও আংশিকভাবে এসেছে।

রাঢ় অঞ্চল, তার প্রকৃতি, সে অঞ্চলের মানুষজন এবং তাদের জীবন জীবিকাকে তারাশংকর বাস্তবসম্মত ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'আরোগ্য নিকেতন', 'সপ্তপ্রদীপ' প্রভৃতিতে। এর মধ্যে রাঢ় অঞ্চলের কোপাই নদীর তীরে গড়ে ওঠা হাঁসুলি বাঁক এবং সেখানে বাস করা কাহার সম্প্রদায়ের মানুষজনদের নিয়ে গড়ে ওঠা 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসখানি এখন পর্যন্ত লেখা বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানে বনোয়ারীলাল এবং করালীচরণের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে দুই কালের দ্বন্দ্বকে দেখানো হয়েছে। তাঁর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-তে বেদে

সম্প্রদায়ের বাস্তব জীবন উঠে এসেছে। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটিতে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বন্দ্বকে দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাসের জীবনমশাই চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

তারাশংকর শেষ পর্যায়ে 'মহাশ্বেতা', 'যোগভ্রষ্ট', 'মঞ্জরি অপেরা', 'ভুবনপুরের হাট', 'গন্নাবেগম', 'অভিনেত্রী' 'ফরিয়াদ' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। এ সময় তারাশংকর অনেকটাই আধ্যাত্মবাদের দিকে ঢুকে গেছেন। ফলে তিনি উপন্যাসের চলতি রীতিকেও অনেক সময় ভেঙ্গে দিয়েছেন। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে 'গন্নাবেগম' তারাশংকরের ঐতিহাসিক উপন্যাস।

এবাবে তারাশংকর প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ষাটটির মত উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলি বরাবরই ছিল মানবতার রসে পূর্ণ। মানুষকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন উপন্যাসে তাদের সেভাবেই প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর চরিত্র পরিকল্পনায় উচ্চবর্ণের পাশাপাশি নিম্নবর্ণের মানুষেরা সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। আর একারনেই তিনি হয়ত জনপ্রিয় হয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন—

''উত্তর শরৎচন্দ্রের যুগে তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাতে আজ আর দ্বিধা নেই।''

ড. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকের সম্পর্কে আর ও বলেছেন—

''তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে যে দুর্লভ বলিষ্ঠতা ও তীব্র আন্তর দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে এবং বিশাল মানববোধের চিত্র, ঐতিহাসিক জীবনচিত্র যেভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাতে শরৎচন্দ্রকে হারিয়ে আমাদের আর ক্ষোভ নেই।''

তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকার বহন করে তারাশংকর যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তা আজও বহমান। তারাশংকরের উপন্যাসগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এগুলিকে নিয়ে অনেক সিনেমা তৈরি হয়েছে, জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিকও তৈরি হয়েছে। এসব কারনেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তারাশংকর আজও গুরুত্বপূর্ণ।